The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp.87- 96)
Published in December, 2025

জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধে বাংলা ভাষা, বঙ্গদেশ ও বাঙালি সত্তা ভাবনা

মো: আবু বকর ছিদ্দিক *

প্রতিপাদ্যসার: জীবনানন্দ দাশের বাংলা ও বাঙালি বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা স্বল্প, কিন্তু গভীর অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি কোন প্রকার ভক্তি ও আবেগের বশবর্তী না হয়ে বাঙালি চিন্তাবিদদের সমালোচনা করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকান্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিদের চিন্তার দুর্বল দিকগুলো তিনি অকপটে তুলে ধরেছেন। জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত তাঁদের ধারণা তৎকালিন বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে সংযোগরহিত। তাঁরা জাতির দৃষ্টিকে বাস্তবতার পরিবর্তে আবেগ-জীবনের অভিমুখী করেন। এ সুযোগে ভারতবর্ষের শাসক ইংরেজ বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। এক সময় বাংলার বাইরেও বাংলা ভাষার প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির কবলে পড়ে বাংলা কেবল পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে এসে সীমাবদ্ধ হয়। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দির কবলে এবং পূর্ববঙ্গে উর্দুর আগ্রাসনের মুখে পড়ে বাংলা ভাষা। দেশভাগের ফলে বাঙালির দারুণ অর্থকষ্ট নেমে আসে । এতে ভাষার দিকে নজর দেওয়ার আর সুযোগ রইল না। তবুও জীবনাননদ দাশ আশাবাদী ছিলেন, বাংলা আবার তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে।

চাবিশব্দ: জাতীয়তাবাদ, ভুল সংজ্ঞা, ভক্তিবাদ, ভাষার বিভক্তি, দরিদ্রতা।

জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি সংক্রান্ত প্রবন্ধের পটভূমি ইংরেজ শাসনের প্রায় দুইশ বছরের বাংলা। এ সময়ে বাংলার পরাধীনতা, অবক্ষয় আক্ষেপের মতো স্থান পেয়েছে প্রবন্ধসমূহে। এ আক্ষেপই জীবনানন্দের প্রবন্ধ সৃষ্টির মূল উৎস। বাঙালি জাতির বেদনায় ব্যথিত হয়েই তিনি জাতি গঠনের বুদ্ধিবৃত্তিক পথে অগ্রসর হন। এ দুইশ বছরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি রচনা করেছেন হাজার বছরের আবহমান বাংলার ও বাঙালির জীবন কথা। তাঁর কাব্যে যে প্রাচীন বাংলার সন্ধান পাওয়া যায় তা বেদনার রঙে রঞ্জিত। বাঙালির চিন্তাগত দৈন্য, অদূরদর্শিতা, ভাবুকতা, ইংরেজ কূটচালে বাংলার বিভাজন ও এর ফলে সর্বনাশা এই পরিণতি প্রবন্ধসমূহের আলোচ্য বিষয়। এক কথায় চিন্তার দৈন্যের ফলে বাংলা দুর্বল হয়ে পড়ে, দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজ বাংলা ভাঙতে সক্ষম হয়, ভাঙনের ফলে দেখা দেয় অর্থনৈতিক দৈন্য। জীবনানন্দ দাশ এভাবে বাংলার অধোগতি দেখিয়েছেন তাঁর বাংলা ও বাঙালি বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে।

কবিতা, গল্প, উপন্যাসের তুলনায় জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সংখ্যা নগণ্য। তবুও যে কয়টি প্রবন্ধ পাওয়া যায় তাতে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় রয়েছে। জীবনানন্দের চেতনার মর্মমূল কোথায় তা প্রবন্ধে সরলভাবে দৃশ্যমান। তাঁর চিন্তার সকল দিক স্বল্প বাক্যে প্রবন্ধে বীজ রূপে অন্তস্থ। এ বীজের মহীরূহ গল্প, কবিতা, উপন্যাস। জীবনানন্দ দাশের চেতনার সারসত্তা এক কথায় বাংলা ও বাঙালি। স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেম থেকে উদ্ভাসিত জীবনানন্দের এই সৃষ্টি। এ-বিবেচনায় তাঁকে একজন জাতীয়তাবাদী কবি বলা যায়। তাঁর বাংলা ও বাঙালি বিষয়ক প্রবন্ধগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনানন্দ দাশের সমকালীন ভাবুকদের মধ্যেও অনুরূপ ভাবনা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) অসংখ্য লেখায় জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুষম জাতীয়তাবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, এদের সুফল ও কুফল নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) মনে করতেন সাম্প্রদায়িক

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বিভাজনের ফলে ভারতীয় ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁর 'নবযুগ', 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', 'মেয় ভুখা হুঁ' 'আমি সৈনিক', 'ক্ষুদিরামের মা', 'ধূমকেতু'র পথ' প্রভৃতি প্রবন্ধে জাতীয় জাগরণের অনুপ্রেরণা রয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) শাশ্বত বঙ্গ, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৫৬) সংস্কৃতি-কথা জাতীয় মুক্তির চেতনায় সমৃদ্ধ। বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি', 'ভাষা ও রাষ্ট্র', 'ভাষা কবিতা ও মনুষ্যত্ব', 'ইংরেজি ও মাতৃভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধে দেশ ও জাতির উন্নয়ন বিষয়ক গভীর ভাবনা স্থান পেয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের স্বল্প সংখ্যক প্রবন্ধ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে বেশ কয়েকটি সমালোচনা রয়েছে। যেমন: "ব্যক্তিক ও দৈশিক: জীবনান্দের শিক্ষা ভাবনা" (মাহবুবুল হক), "বেসরকারি কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ" (মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গিরি), "জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ: সমাজ ও শিক্ষা ভাবনা" (সরদার আবদুল মান্নান)। জীবনানন্দ দাশ কর্তৃক রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রয়েছে। এ নিয়ে আলোচনা করেছেন গবেষক তপন বাগচী। তাঁর প্রবন্ধের নাম, "গ্রন্থ সমালোচক জীবনানন্দ দাশ"। চরিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে একটি আলোচনা লিখেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তাঁর প্রবন্ধের নাম, "জীবনানন্দ দাশের তিন প্রবন্ধ"। কবিতায় নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ *কবিতার কথা* নিয়ে অম্বুজ বসুর প্রবন্ধ, "কবিতার কথা ও অন্যান্য"। তাঁর প্রবন্ধসমূহের সার্বিক আলোচনামূলক প্রবন্ধগুলো হলো সরদার আবদুল মান্নানের "জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ: চিন্তার বহুসূত্র", আবদুল মান্নান সৈয়দের "প্রবন্ধ"। সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) অনুসারে মোটামুটি এ কয়টি সমালোচনার মধ্যে জীবনানন্দের প্রবন্ধ বিষয়ক বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ। তাঁর সাহিত্য ভাবনার একটি মৌলিক বিষয় বাংলা ও বাঙালি, এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ থাকলেও সমালোচকগণ আজও সেদিকে দৃষ্টি দেননি। তাই জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা নিয়ে তাঁর ভাবনা বিষয়ে চলমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা বিষয়ে জীবনানন্দ দাশের চিন্তার বিশ্লেষণই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এতে গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর সকল উপাত্তই মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) থেকে সংগৃহীত। আর মূল পাঠ জীবনানন্দ দাশের তিনটি প্রবন্ধ 'যুক্তি জিজ্ঞাসা ও বাঙালি', 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' এবং 'The Future of Bengali Language and Literature'। মুল পাঠকে তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে ফলাফল (Findings) বের করা হয়েছে। যদিও প্রবন্ধ সংখ্যা স্বল্প কিন্তু, এতেই জীবনানন্দ দাশের চিন্তার বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে। এজন্য এ প্রবন্ধসমূহ বিশ্লেষণ যৌক্তিক এবং তা জীবনানন্দ দাশকে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৫৭ সালে বাংলা বৃটিশ কর্তৃক পদানত হয়। ইংরেজ শাসনকালের প্রথম ক্ষতিকারক একটি ঘটনা ১৭৭০ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি। এরপর একে একে বাংলার ক্ষতি সাধন হতেই থাকে। সামরিক দিক থেকে ইংরেজদের সাথে পেরে ওঠার কোন উপায় না দেখে বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের পথে হাঁটে। সে পথে সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকলেও কার্যত তা নানা কারণে লাভ করা সম্ভব হয়নি।

এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে যে, ইংরেজ আমলে বাঙালি নতুন চিন্তার জগতে প্রবেশ করে। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সর্বপ্রথম সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় সংস্কারের কাজ শুরু করেন। কিন্তু এ ধারা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। রাজা রামমোহনের পর সমাজের অগ্রগতির চেয়ে পশ্চাৎ গতিই বেশি হয়েছে। রামমোহন যে মহৎ উদ্দেশ্যে সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর শিষ্যরা তা উল্টো বুঝে সংস্কার বাদ দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সংস্কার প্রচেষ্টা ভিন্ন পথে ধাবিত হয়েছে। রামমোহনের প্রধান অস্ত্র ছিল যুক্তি। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের প্রধান অস্ত্র হয়ে যায় ভক্তি। রামমোহনের পর অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) কিছুকাল যুক্তির শিখা প্রজ্বলিত

রাখলেও তিনি একাধারে ভক্তিবাদেরও পোষক ছিলেন। এছাড়া কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) ও স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এ ধারাকে সম্পূর্ণরূপে ভক্তিবাদে ডুবিয়ে দেন। জাতি যুক্তিবাদিতা ভুলে গিয়ে ভাবসাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে। এ সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন,

> মন্থরগতি ব্রাহ্মদল, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তী কবি-সাহিত্যিকেরা, শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর সম্প্রদায়, আর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও তাঁদের ভক্তসমাজ; এর উপরে ছিল শুধু সেই কালের বাংলার বা ভারতের নয়, বৃহত্তর জগতের উদারমানবিকতা, গণতন্ত্র, আর বিজ্ঞানের আকর্ষণও। তবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপরে শেষের দিকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব, তাতে তাঁর সমর্থিত যোগ ও সন্ন্যাসের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য দলের প্রবণতা জাগে। কিন্তু তার চাইতে আরো ব্যাপকভাবে দেখা দেয় হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যের গৌরববোধই। এই ঐতিহ্যগৌরববোধ যে আসলে দুর্বল, যদিও আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী মনে হয়, তা আমরা বলতে চেষ্টা করেছি। স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ বীর্যবত্তাও এই ঐতিহ্যগৌরববোধকে প্রকৃত সবলতা দান করতে পারেনি, কেননা, তাঁর সেই অপূর্ব বীর্যবত্তার সঙ্গে যোগ ঘটেছিল প্রবল সন্ন্যাসপ্রীতির মতো জীবনবিমুখ ব্যাপারের আর সাধারণভাবে জগত ও জীবন সম্বন্ধে চিন্তার অপরিচ্ছন্নতারও (১৫০)।

তাঁদের অপার্থিবতাই জীবনান্দের দৃষ্টিতে বাংলার পশ্চাৎপদতার মূল। রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ বলেন,

> নতুন ভারতবর্ষে তিনি যে ধরনের মনের প্রথম ও (সবচেয়ে) ব্যাপক ব্যবহার করে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে দেশের কোথাও কোথাও মানুষ ও সমাজ সেদিক দিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল, আজো করছে, কিন্তু দোষ ও অন্ধতার যে ঢের সংস্কার আশা করা গিয়েছিল সেটা কাজে বিশেষ কিছু হল না (৫৬৩)।

রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি চিন্তাবিদদের জাতীয়তাবাদ বিষয়ক চিন্তারও কঠোর সমালোচনা করেছেন জীবনানন্দ দাশ। ধর্ম ও জাতীয়তাবাদকে এক করতে গিয়ে তারা এক অদ্ভুত দর্শনের জন্ম দেন, যা তৎকালীন বৈশ্বিক ভাবনার অনুকূলে ছিল না। সকল ধর্মই আন্তর্জাতিক প্রবণতা সম্পন্ন, কিন্তু জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিক সীমানা ভিত্তিক। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব নয়। কিন্তু এ দুয়ের সমন্বয় করতে গিয়ে তাঁরা যে ভাবনার উদ্ভব ঘটিয়েছেন তার দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে জীবনানন্দের চোখে। তাঁর মতানুসারে জাতীয় ব্যাপারে তাঁরা যে উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন তা প্রকৃত বৈশ্বিক অবস্থা ছিল না। পরাধীন মানসিকতা নিয়ে তাঁরা বিশ্বকে দেখেছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমাদের উন্নতির পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে 'আমরাই জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি'- এই গোঁড়ামি একটি' (জীবনানন্দ ৫৬৩)। কিন্তু বাস্তবিক বিশ্ব তখন এ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পর্তুগিজ, স্পেনীয়, ইংরেজ, ফরাসি এ আত্মবিশ্বাসের বলেই বিশ্ব শাসনে বের হয়েছিল এবং বিশ্ব শাসন করেছিল। জাতীয় আত্মশক্তিকে খাটো করে দেখা এক প্রকার আত্মপ্রতারণা। জীবনানন্দ মনে করেন,

> আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষে বা বাংলায় যদি জাতীয়তাবাদ বেশি ঢুকে থাকে তাহলে যে স্থূল চিন্তা চেতনার ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়েছে রামমোহনের কাছে তা কোনো সমর্থন পেত না। কিন্তু আমেরিকা ব্রিটেন সোভিয়েট রাশিয়া- পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই আজ জাতীয়তাবাদী, কেউ কেউ ভারতবর্ষের চেয়ে ঢের বেশি; শুদ্ধ লোককল্যাণের পথে- রামমোহন বা মহাত্মা গান্ধীর যুক্তি ও সেবার পথে প্রায় কেউই চলেনি; ... গোটা পৃথিবীর হৃদয় মনকে না বদলাতে পারলে কোনো বিচ্ছিন্ন দেশের মন ও কাজের পদ্ধতি বদলানো প্রায় অসাধ্য ব্যাপার (৫৬৪)।

জীবনানন্দ দাশ রামমোহন ও গান্ধীর আপোষমুখী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। রামমোহন, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর বিশ্বপ্রেম একটি বিচ্ছিন্ন ধারণা। গোটা পৃথিবী যেখানে জাতীয়তাবাদী সেখানে রামমোহন, গান্ধীর বিশ্বপ্রেম

আত্মপ্রতারণার সামিল। জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী কোন প্রত্যয় নয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগঠন জাতিসংঘ, যা ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গঠিত হয় এবং সেখানেও জাতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল সানফ্রান্সিকোতে বিশ্বের ৫০টি জাতি জাতিসংঘে যোগ দেয়। (বিবেক-খ ৪৫৯) জাতির সাথে জাতির সম্মিলনই আন্তর্জাতিকতা। সুতরাং আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রত্যয়টিই জাতিকে স্বীকার করে নিচ্ছে। সে হিসেবে রামমোহন ও গান্ধীর আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তায় সংকট রয়েছে। সারা পৃথিবীই যখন জাতীয়তাবাদী তখন ভারত জাতীয়তাবাদী হলে দোষের কিছু ছিল না।

জীবনানন্দ দাশের মতে পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদ একটি স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। এমনকি ধর্মের ভিতরেও জাতীয়তাবাদ ঢুকে গেছে। জীবনানন্দ দাশ আরো দেখেন যে, কিছু কিছু জাতির জন্য একক ঈশ্বর রয়েছে। আবার একই ধর্মেও জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বিভেদ রয়েছে। যেমন ইংরেজও খ্রিস্টান, জার্মানও খ্রিস্টান অথচ তাদের মধ্যে জাতিগত বৈরিতা হাজার বছরের। আবার হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রেরণা, অনুরূপ আল্লাহ শব্দটি মুসলিম জাতীয়তাবাদের সমন্বয়ক। ধর্মীয় নেতারা ধর্মীয় ঐতিহ্যকে নিজ নিজ ধর্মীয়জাতির উন্নতির প্রেরণা মনে করেন। ক্ষেত্রবিশেষে অন্য ধর্মের ঐতিহ্যকে ঘৃণাও করে থাকেন। এক ধর্মের মঙ্গল অন্য ধর্মের জন্য মঙ্গলকর নাও হতে পারে। তখন অন্য ধর্মের লোকদের পরাস্ত করাই হয়ে যায় ধর্ম। নীতিহীনভাবেও তারা নিজ ধর্মের উন্নতি করতে দ্বিধা করেন না। ধর্ম ও ঈশ্বরকে যারা সত্য বলে মানেন এটিই তাদের চরিত্র। রামমোহন, বিবেকানন্দ ও গান্ধী জাতীয়তাবাদের রুদ্র মূর্তির সামনে ধর্মকে আদর্শ হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবে ধর্মীয় গোঁড়ামি উগ্র জাতীয়তাবাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তাদের অধ্যাত্মবাদ আধুনিক পৃথিবীতে অচল। বরং জাতীয়তাবাদ এর চেয়ে সহনশীল ও বাস্তব। জাতীয়তাবাদের উগ্রতা যুদ্ধ বাধায় ঠিক, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় ধর্মীয় উগ্রতার জন্য এর চেয়ে ভয়ঙ্কর, বীভৎস যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে শত শত বছর ধরে। সুতরাং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের তুলনায় আধুনিক জাতীয়তাবাদ সব দিক দিয়েই বেশি সহনীয় ও গ্রাহ্য।

রামমোহন, বিদ্যাসাগরের পর মার্কসবাদ, রুশ বিপ্লব, লেনিন ট্রটস্কির সমাজতন্ত্রবাদ বাঙালির মনে তাদের উত্তরাধিকার সৃষ্টি করবে এমনটা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু কার্যত বাঙালির মনে তা তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। গান্ধীর অকার্যকর, নিষ্ফল, অপরিণামদর্শী, অস্পষ্ট, অধ্যাত্মবাদী, শান্ত বিপ্লবের দিকেই বাঙালি ঝুঁকে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কিছুই পেল না। জীবনানন্দ দাশ বলেন, 'গান্ধীর দর্শনেরও সহজ অথচ (তাঁর দেশবাসীর কাছে যা দেখছি) দুঃসাধ্য যুক্তি বাঙালি বড়ো বেশি নিল না'। (জীবনানন্দ ৫৬৫) গান্ধী মার্কসবাদী, সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী চিন্তা বাঙালির মধ্যে প্রবেশ করতে বাধা হয়ে দাঁড়ান কিন্তু, নিজেও কিছু দিতে পারলেন না। বৈশ্বিক আন্দোলন থেকে যা প্রাপ্তি ছিল তা থেকে বরং বাঙালি বঞ্চিত হল। কতক পণ্ডিতের তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই মার্কসবাদ তখন সীমিত হয়ে রইল।

ধর্মের মূল নীতি বিশ্বাস। ধার্মিকের কাছে যুক্তির স্থান গৌণ। জীবনানন্দ দাশের মতে, 'যারা অশিক্ষিত আধা-শিক্ষিত তারাই শুধু নয়, অনেক সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকও ভক্তিকেই ধর্ম মনে করেন- অন্ধ ভক্তিকেও।' (জীবনানন্দ ৫৬৬) এ অচলায়তনে আঘাত হেনেছিলেন ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যরা। কিন্তু তাঁদের যুক্তিবাদী মননের একটি বড় বাধা ছিল রামমোহনের অর্ধযুক্তিবাদ। রামমোহনকে ডিরোজিওর শিষ্যরা 'half liberal' বলে অভিহিত করতেন। (সফিউদ্দিন ১২০) বাঙালি হাফ লিবারেল হতে পেরেছিল ক্ষণিকের জন্য। ডিরোজিওর শিষ্যদের মতো পূর্ণ লিবারেল হওয়ার সুযোগ তাদের হয়নি। ডিরোজিওর অকাল প্রয়াণে তাঁর যুক্তিবাদের প্রবাহ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যায়। তেমনি রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর হাফলিবারেল মতবাদ ক্রমে গোঁড়ামির দিকে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এভাবে উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে যুক্তিবাদিতা ক্ষণিক আলো দেখিয়ে আবার অন্ধকারেই বিলীন হয়ে

পড়ে। জীবনানন্দ দাশ বলেন, 'উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে যা এসেছিল তার কোনো বিকাশ হয়নি (বরং সেটুকুর থেকেও পতন হয়েছে) মনে হয়' (৫৬৬)।

এখন বাঙালির জীবনে 'অন্ধ অবস্থাই সব' (জীবনানন্দ ৫৬৬)। যে যুক্তি-জিজ্ঞাসা বাঙালির মনে উদয় হয়েছিল তা ক্ষণিক আলো দিয়ে নিভে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা যখন রেনেসাঁ, ফরাসি বিপ্লব, ১৮৪৮-৫০ সালের ইউরোপের সর্বব্যাপি বিপ্লব, রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে ধর্মের খোলস থেকে, মধ্যযুগীয় নিয়ন্ত্রণবাদ থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তি ও প্রমাণকে মেনে নিচ্ছে সেখানে বাঙালি অন্ধবিশ্বাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জীবনানন্দ দাশের মতে, 'আমাদের দেশে না হোক, অন্য নানা দেশে যারা সজাগ মনে চলতে চায় তারা নীতি গ্রহণ করে ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে' (৫৬৬)। সব ক্ষেত্রেই তারা প্রশ্ন করছে এবং সমাধান খুঁজছে। কিন্তু আমাদের দেশে অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তিই হয়েছে সাধারণের অবলম্বন। 'ধর্ম ও ভক্তির নামে প্রায়ই বিচারের থেকে মনকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে' (জীবনানন্দ ৫৬৬)।

ভক্তিবাদের ফলে বাঙালির জাতীয় জীবনে চিন্তার দৈন্য দেখা দেয়। বাঙালিকে এ ঘোরের মধ্যে পেয়ে ইংরেজ বাঙালির অন্তর্নিহিত শক্তির মূলে একের পর এক আঘাত করে। প্রথমত বাংলাকে ভাষাগত বিভাজনে বিচ্ছিন্ন করে পরে প্রশাসনিকভাবে বিভক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে দুর্বল করতে সক্ষম হয়। ১৯১১ সালে বাংলা পুনরায় একত্রিত হলেও ততদিনে আরেকটি দেয়াল দাঁড়িয়ে যায়। ওই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে বাংলা আবার বিভাজিত হয়। ভক্তিবাদ বাঙালিকে এতটাই মেধাহীন করে ফেলে যে জীবনানন্দ দাশ বিস্মিত হয়ে দেখেন, আমাদের সাহিত্যে পর্যন্ত যুক্তি জিজ্ঞাসা নেই। তিনি বলেন, 'গান্ধী মার্কস কিয়ের্কগার্ড বা অন্য কারো সিদ্ধান্ত ও দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের বিশেষ কোনো সাক্ষাৎ যোগ নেই' (৫৬৬)। জীবনানন্দ দাশ হতাশ নন। এভাবে তাঁর প্রবন্ধে তিনি যুক্তিবাদের দিকে বাঙালি জাতিকে আহ্বান জানান।

প্রাচীনকালে ভাষার ভিত্তিতেই জাতি গড়ে উঠতো। ওজকিরিমলি বলেন, "It is true beyond doubt that wherever a separate language is found there a separate nation exists" (Ozkirimli 17)

আধুনিক জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তিসমূহের একটি অনন্য ভিত্তি হল ভাষা। ইরেনেজ পাওয়েল কারলোভস্কি ও এদ্রি মারসিন সেজিকি জাতি গঠনের চারটি মানদণ্ড দাঁড় করিয়েছেন। তাদের মতে,

> 1. A strong emphasis on genealogy on the fictive tie of ethnic descent defining membership of community 2. The importence of vernacular culture including myths of elective, linguistic code, customs and traditions. 3. A nationalist interpretation of history, or 'ethno-history'- the rest of authentic tales retold by the community 4. A commitment to 'the people,' and hence an emphasis on popular mobilosation as the key to authenticity" (Karoleswski and Suszycki 2011, 21).

জাতি গঠনের দ্বিতীয় ভিত্তি সংস্কৃতি এবং ভাষা ও সাহিত্য। জীবনানন্দ দাশ বলেন,

> নিজ ভাষা ও সাহিত্যের বিশদ ব্যাখ্যান ও সম্পদ বর্ণনার ভিতর দিয়ে নিজের জাতীয় স্বার্থের আবেশ মনকে বিহ্বল করতে পারে। বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর বিশেষ ও খুব সম্ভব ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো ভাষা ও এ সাহিত্য এ দেশের সবচেয়ে বড়ো সাহিত্য (৫৬৪)।

এ ভাষার ভিত্তিতে আধুনিক বাঙালি একটি উন্নত জাতি গঠন করতে সক্ষম হতো। কিন্তু চোখের সামনে এত বড় একটি ভাষার অবক্ষয় দেখে জীবনানন্দ দাশ মর্মাহত হয়েছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত বাংলা ভাষার স্বর্ণময় সময় অব্যাহত ছিল। যে ভাষা জাতীয়তাবাদের ভিত্তি এবং ইংরেজদের সর্বপ্রথম নজর পড়ে সে ভাষার উপর। জার্মান জাতি যখন একত্র হচ্ছিল তখন ভাষা একটি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। জার্মান জাতির জনক বিসমার্ক-এর সময় ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ সালের দিকে 'জার্মানিতে সংস্কৃতিগত, ভাষা ও ভাবগত ঐক্যের প্লাবন বইতে থাকে' (মাইতি ২৫৮)। যখন 'জার্মান বলা লোক মাত্রই জার্মানি' এ চেতনা সামনে রেখে জার্মান একত্র হচ্ছিল, এ সময়ে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে বাংলাকে নানা অজুহাতে কেবল ভাঙছিলো। ভাষাগত ভাঙ্গনের পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ বলেন,

> নবাবি আমলে ও পরে ব্রিটিশ যুগ থেকে আজকের তিন-চার দশক অবধি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উঠতি-পড়তির ভেতর বেশ একটা একটানা যুগ চলে গিয়েছে; ভাষা ক্রমে ক্রমে তৈরি হচ্ছিল, স্বাস্থ্য হল, ভারতবর্ষের একটা বড়ো ভাষা হয়ে দাঁড়াল; রবীন্দ্রকালের বাংলা পৃথিবীরই প্রায় যে কোনো বড়ো ভাষার সমান হয়ে উঠল; এমনকি ইংরেজি-ফরাসির কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে প্রায়- এমন কথাও ভাষাবিদ পণ্ডিত লোকদের বলতে শুনেছি (৫৫৪)।

চর্যাপদের যুগে বাংলা ভাষা অঞ্চল ছিল আসাম, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বিস্তৃত। বৃহৎ বঙ্গের প্রথম লিখিত নিদর্শন চর্যাপদ। আহমদ শরীফ বলেন, 'চর্যাগীতি যে প্রাচীন বাঙলা তা আজো সর্বজন-স্বীকৃত সত্য নয়। হিন্দি, মৈথিলি, উড়িয়া, অসমীয়াও এর দাবীদার। ... সব সিদ্ধার বাড়ি বাঙলায় নয় (শরীফ ১১৭)। এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় সুকুমার সেনের মতামতে। তিনি বলেন, 'ওড়িয়া-অসমিয়ার সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। আদিতে এই তিনটি এক ত্রিবেণী ভাষা-নদী ছিল' (১৩৫)। বাংলার এ সমৃদ্ধি, ব্যাপ্তি ইংরেজ আমলেও প্রসারমান ছিল। জীবনানন্দ দাশ বলেন,

> এ ভাষা একদিন অবাঙালিদের বলয়ব্যাপ্তির ভেতর ক্রমেই বেশি ছড়িয়ে পড়ছিল। উনিশ শতকের বাংলা মননের সবদিক দিয়েই বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে এসেছিল; সেই জন্যই হয়ত বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মর্যাদাও বেড়ে গিয়েছিল ঢের। অবাঙালিরা এদেশে কাজকর্মে বিদেশেও বাঙালিদের সঙ্গ-সান্নিধ্যে এসে বাংলা ভাষার শক্তি-সাফল্যের কথা মনে রেখে বাংলা শিখে নিচ্ছিল। শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিতেরাও তখনকার দিনের প্রায় সমস্ত ভারতীয় ব্যাপারের একক বাঙালি অধিনায়কদের মুখের ও বইয়ের ভাষার মর্যাদা মেনে নিয়ে বাংলা জানা দরকার মনে করেছিলেন (৫৫৭)।

বাংলা ভাষার এমন সমৃদ্ধি ইংরেজকে ভীত করে তোলে। এমন সুকৌশলে ভাষাকে ভাগ করা হয়, যা আজো অনেকে ওয়াকিফহাল নন। ম্যাক্সমুলার, উইলিয়াম জোন্স, আব্রাহাম গিয়ার্সন প্রভৃতি পণ্ডিত এ ব্যাপারে ক্রীড়ানকের ভূমিকা পালন করেন। ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে উড়িয়া ও অসমীয়াকে বাংলা থেকে আলাদা করা হয়। ১৮৭২ সাল অবধি অসমীয়া ভাষা বাংলা বলেই পরিচিত ছিল। এর অব্যবহিত পরে উড়িয়া আলাদা ভাষা হিসেবে বিচ্ছিন্ন হয়। গোলাম মুরশিদ ওড়িয়া ও অসমীয়াকে বাংলা ভাষাই বলেছেন, 'বঙ্গ-ভূমির অপভ্রংশ এবং অবহট্ট থেকে আরও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা (ওড়িয়া এবং অসমীয়া) ভাষার জন্ম' (মুরশিদ ১৪)। সুকুমার সেন মাগধি প্রাকৃতকে বাংলা ভাষার জননী বলেছেন। তার মতে, 'ভোজপুরী (বা ভোজপুরিয়া), মৈথিলী, মগহী, ওড়িয়া, বাঙ্গালা ও অসমিয়া- এই ছয়টি ভাষা মগধীয় গুচ্ছের অন্তর্গত' (সুকুমার ১৩৫)। অথচ মাগহী বা বিহারী ভাষাকে ভিন্ন ভাষা বলে ঘোষণা করা হয়। বিভাজনের পর জীবনানন্দ দাশ আফসোস করে বলেন,

> বাংলার উত্তর-পশ্চিমে-বিশেষত এখানকার বিহারের যেসব অংশ এক সময় বাংলাদেশ ছিল, এখনো যেখানে বাঙালি বা বাংলার চল অবাঙালির চেয়ে বেশি সেসব জায়গা বাংলা তার আজকের এই বিপন্নতায় ফিরে পেলে খানিকটা নিশ্চিত হতে পারত। এ নিয়ে বাঙালিদের নানারকম আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু কিছু ফল হয়নি আজ পর্যন্ত; হতে পারবে বলে মনে হয় না। বিহারেরও সব জায়গায় বাংলা ভাষা পর্যন্ত চলল না- যা এতদিন স্বাভাবিক অধিকারে যুক্তির আশ্রয়ে চলছিল (৫৫৭)।

এভাবে বৃহৎ বঙ্গের প্রথম বিভাজন হয় ভাষা বিভাজনের মাধ্যমে। এ বিভাজনের বিরুদ্ধে বাঙালি তখন সোচ্চার ছিল না। বৃহৎ বঙ্গের যে সীমানা রয়েছে তাতে মগধ বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নীহাররঞ্জন রায় বাংলার সীমা সম্পর্কে বলেন,

> উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয়ধৃত নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য; উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্ব দিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুণ্ড-বরেন্দ্রী-রাঢ়-সুহ্মা-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বাঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদীবিধৌত বাঙলার গ্রাম, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্ম ভূমি। একদিকে সু-উচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য-ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য (৭০-৭১)।

১৯০০ সালের আগে রাজনৈতিক অঙ্গনে বাংলা এবং ভারত খুব একটা সচেতন ছিল না। এ সুযোগে দূরদর্শী ইংরেজ বাংলার উত্থানের প্রাথমিক সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দেয় উপভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে, বাংলার সাথে অসমীয়া ও উড়িয়ার সামান্য পার্থক্য বের করার দ্বারা। উড়িয়া ও অসমীয়ার সাথে বাংলার যে পার্থক্য তার চেয়ে বেশি পার্থক্য লক্ষ করা যায় চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুরের ভাষার সাথে। যে যুক্তিতে উড়িয়া ও অসমীয়া আলাদা ভাষা সে যুক্তিতে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর অঞ্চলের ভাষাও স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে নিজেদের দাবি করতে পারে। এতে বাংলা বলে কোন ভাষাই আর থাকবে না। বাঙালি যখন সচেতন হল ততদিনে বাঙলা কেবল পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ল। এতেও ইংরেজদের বাংলা ভীতি দূর হল না। প্রশাসনিকভাবে বাংলাকে দুইভাগ করার চেষ্টা চলল। সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'ব্রিটিশের বোধটা ছিল এই রকমের যে বাংলাকে দু'টুকরো করা দরকার, কেননা অখণ্ড বাংলা রাজনৈতিকভাবে ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে' (সিরাজুল ১৫)। লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভারত সচিবকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাদের উদ্বেগের কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। চিঠিটির মর্মার্থ হল:

> বাঙালীরা, নিজেদেরকে যারা একটি জাতি বলে ভাবতে পছন্দ করে, এবং যারা এমন একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যখন ইংরেজদেরকে বিদায় করে দিয়ে কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউজে একজন বাঙালী বাবুকে অধিষ্ঠিত করবে, তারা অবশ্যই তাদের ওই স্বপ্ন বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ ঘটাতে পারে এমন যে কোনো প্রতিবন্ধকের ব্যাপারে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করবে। আমরা যদি তাদের হৈচৈ-এর কাছে নতি স্বীকার করার মতো দুর্বলতা প্রকাশ করি, তাহলে আগামীতে বাংলাকে কখনোই খণ্ডিত বা দুর্বল করতে পারবো না, এবং ভারতের পূর্ব পার্শ্বে আপনি এমন একটি শক্তিকে সংযুক্ত ও দৃঢ় করবেন যেটি ইতিমধ্যেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে তা ক্রমবর্ধমান গোলযোগের নিশ্চিত উৎস হয়ে দাঁড়াবে (সিরাজুল ১৫)।

'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলাকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯০৫ সালে বাংলা প্রথম প্রশাসনিকভাবে দুই ভাগ হয়। ১৯১১ সালে পুনঃএকত্রীকরণ হলেও বাংলা যে ইংরেজ রোষানলে পড়েছে তা সারা ভারতব্যাপী স্পষ্ট হয়ে যায়। এতে বাংলার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলার অবক্ষয় চূড়ান্ত পথে এগুতে থাকে। ১৯৪৭ সালে এসে বাংলার সবচেয়ে আলোচিত বিভাজনটি সংঘটিত হয় তাদের নতুন কৌশল, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে, অনেক রক্তের বিনিময়ে। বাংলা অনেক ছোট হয়ে যায়। জীবনানন্দ দাশ বলেন,

> খণ্ডনের আগে বাংলাদেশ বড়ো ছিল; প্রায় তার এক-তৃতীয়াংশ এখন দাঁড়িয়েছে পশ্চিম বাংলা। ... কিন্তু আসল কথা, বাংলাদেশে বাঙালি ঢের কমে গেছে। মন্বন্তরে গিয়েছিল, কিন্তু এবারে সমস্ত পুর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের আমরা হারিয়েছি। দেশ ছোটো, লোকজন কম (৫৫৬)।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর অপ্রধান অংশের মানুষও বাংলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। জীবনানন্দ দাশ বলেন, 'বাঙালি একদিন-এমনকি কুড়ি-বাইশ বছর আগেও মনে করেছিল যে, বাংলা যে রকম ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান স্বভাবতই তার প্রাপ্য' (৫৫৭)। কিন্তু ইংরেজ রোষানলে পড়ে বাংলা তার সকল আভিজাত্য হারায়। তিনি দুঃখ করে বলেন, 'ভারত রাষ্ট্রের ভাষা হওয়া দূরে থাকুক, বাংলা এখন সমস্ত বাংলাদেশেরও ভাষা নয়' (৫৫৭)।

পূর্ববাংলায় বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছে বাংলাকে। জীবনানন্দ এতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল বাঙালি কখনও উর্দুকে গ্রহণ করবে না। তবে তিনি এই শেষ মীমাংসাটি দেখে যেতে পারেননি।

বিভাজনের পর বাঙালি দারুণ অর্থকষ্টে পড়ে। চাকরি নেই, ঘর নেই, ভাত নেই। এরকম দুঃখ-কষ্টে পড়ে বাঙালির তখন মরণ দশা। এ সময় ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে নজর দেওয়ার মতো পরিবেশ নেই। ইতোপূর্বে এমন দুর্দিন বাঙালি ও বাংলা ভাষার হয়নি বলে মনে করেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর মতানুসারে, বাংলা এক সময় ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর সে স্থান দখল করেছে হিন্দি ভাষা। এজন্য জীবনানন্দ দাশের আফসোসের সীমা ছিল না। তিনি বলেন, যে বাংলা একদিন ভাত কাপড়ে ঘরে তৃপ্তি পেয়ে গল্প রূপকথা বচন ছড়া ইত্যাদি তৈরি করেছিল বাংলার সে হৃদয় নেই এখন, সেসব লোক নেই, সে প্রবাদ, ছড়া লেখ-লেখন নতুন যুগে কোনো যুক্তিঘন ক্রমবিকাশ লাভ করল না, মরেই গেল- মানুষই মরে যাচ্ছে বলে (৫৫৯)।

বাংলা ভাষার উপর ক্রমাগত এত বিপত্তির পরও জীবনানন্দ দাশ আশা ছাড়েননি। বাংলা আবার তার পুরনো গৌরব ফিরে পাবে। তিনি আত্মবিশ্বাস ভরে বলেছিলেন, বাংলার ক্ষেত্র ছোট হয়ে গেলেও এর প্রাণ সম্পদ কমেনি। তিনি বলেন, 'The language itself, Bengali, rich, vital, and progenitor of a long succession of great writers, could hardly disintegrate (৬৮৩)। ভাষা তার মহত্ব প্রকাশের জন্য ভূমি ও জনসংখ্যার উপর কখানো কখনো নির্ভর নাও করতে পারে। এ জন্য তিনি এথেন্স, গ্রিক ও ব্রিটেনের উপমা টেনেছেন। তিনি বলেন, 'Athens or Greece or Britain did not need much of land to make their greatness widely felt' (৬৮০).

বাঙালি ও বাংলা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছে এ বিষয়ক প্রবন্ধ তিনটিতে। বাঙালির চিন্তার দুর্বল দিক, ইংরেজ কর্তৃক বাঙালি জাতীয় চেতনার বিনষ্টি ও সে কারণে বাঙালির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা যৌক্তিকভবে কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুসারে উপস্থাপন করেছেন জীবনানন্দ দাশ। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে বাঙালি জীবনজিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। কিন্তু চিন্তাগত দুর্বলতা, যুক্তির সাথে ভক্তির মিশ্রণ, লক্ষ্যের অস্পষ্টতা সে ক্ষেত্রে সফল হতে দেয়নি। পার্থিব না হয়ে আধ্যাত্মিক পথে ঝুঁকে পড়ে বাঙালি। ভক্তিবাদ তাদের যুক্তিবাদিতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সেকালে বাঙালির জাতীয় চিন্তায়ও অধ্যাত্মবাদ ঢুকেছিল, তাই তারা বাস্তবিক চিন্তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ইংরেজ এ সুযোগে বাঙালির জাতিসত্তা ও জেগে ওঠার মুলে কুঠারাঘাত হানে। তারা বাঙালির একত্রিত হওয়ার শক্তিশালী মাধ্যম বাংলা ভাষাকে বিভাজন করে। এতে বৃহৎ বঙ্গ একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে গিয়ে সীমিত হয়। এরপর তারা সাম্প্রদায়িক উস্কানির মাধ্যমে বাঙালিকে প্রশাসনিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তান নামে দুই ভাগে বিভক্ত করে। এর ফলে পূর্বপাকিস্তানে রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অথচ বাংলা ভাষা এক সময় সমগ্র ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। সে ভাষা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর ভারত হিন্দির কাছে এবং পুর্বপাকিস্তান উর্দুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। জীবনান্দ দাশ দেখতে পান বিশাল একটি ভাষা কিভাবে বিপন্ন অবস্থায় পড়ে কেবল অল্প সংখ্যক মানুষ ও ভূমির মধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় পরিণত হয়। দেশ ও ভাষা ভাগের কারণে বাঙালি দারুণ অর্থাভাবে পড়ে। ভাষাগত ক্ষতি পূরণের ক্ষমতা তখন বাঙালির আর রইল না। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যগত, ভাষাগত বিষয় নিয়ে ভাবনা দূরে থাক, উদরের চিন্তায় বাঙালি তখন অস্থির। এভাবে জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধের মাধ্যমে স্বল্প আয়তনে বাঙালির দুর্দশার কারণ ও চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে।

বাঙালি ও বাংলা বিষয়ক প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ বাঙালি চিন্তাবিদদের নির্মোহ সমালোচনা করেছেন। চিন্তাগত দিক দুর্বল হলে আর কোন দিকেই সবলতা অর্জনের উপায় থাকে না। উনিশ শতকে বাঙালি যুক্তি ছেড়ে ভক্তির পথে অগ্রসর হয়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। পৃথিবী ভক্তির পথ পরিহার করে পার্থিব উন্নয়নের নিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে আর বাঙালি ভক্তির নেশায় মত্ত হয়ে কর্মবিমুখ হয়েছে। এ জন্য ইংরেজের হাতেও তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। বাঙালি কিভাবে জেগেছিল আবার কিভাবে নির্বাপিত হল তার দার্শনিক আলোচনা জীবনানন্দ দাশের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তিনটিতে বিদ্যমান। অল্প কথায় তিনি তাঁর প্রবন্ধে বাঙালিকে বাঙালির ত্রুটিসমূহ নির্দেশ করে উপযুক্ত পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

আবদুল ওদুদ, কাজী। *বাংলার জাগরণ*। কথাপ্রকাশ, ২০১৭।

আহমদ, সফিউদ্দিন। *ইয়ংবেঙ্গল মুভমেন্ট ও ডিরোজিও*। বাংলা একাডেমি, ২০০৯।

ইসলাম চৌধুরী, সিরাজুল। জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি ১৯০৫-৪৭। সংহতি, ২০১৬।

দাশ, জীবনানন্দ। *জীবনানন্দ-রচনাবলি চতুর্থ খণ্ড*। ঐতিহ্য, ২০১৭।

প্রভাতাংশু মাইতি, শ্রী। *ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা*। শ্রীধর প্রকাশনী, ২০১৮।

মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ। *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস-২*। নবপত্র প্রকাশন, ২০২১।

মুরশিদ, গোলাম। *বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য*। প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯।

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*। দে'জ পাবলিশিং, ১৪২০।

শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য-১*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৪।

সেন, সুকুমার। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। আনন্দ, ২০০১।

Karoleswski, Ireneusz Pawel and Suszycki, Andrzej Marcin. *The Nation and Nationalism in Europe an Introduction*. Edinburgh University Press, 2011.

Ozkirimli, Umut. *Theories of Nationalism*. Palgrave, 2017.